৩

গ্রীক রাষ্ট্রদর্শন : এরিস্টটল এবং তৎপরবর্তী রাষ্ট্রদর্শন

ভূমিকা: এরিষ্টটলকে বাদ দিয়ে প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্রচিন্তা কল্পনা করা যায় না। তাঁকে রাজনীতি বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। কারণ একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে রাজনীতি বিজ্ঞানের ভিত তিনিই প্রথম তৈরী করেন। তিনি ছিলেন গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর ছাত্র এবং দ্বিগ্বিজয়ী বীর আলেকজান্ডারের গৃহ শিক্ষক। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। নীতিশাস্ত্র, অধিবিদ্যা, রাজনীতি, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যাসহ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি বিচরণ করেছেন। রাজনীতি বিষয়ক পুস্তকের মধ্যে তাঁর রচিত *'দি পলিটিকস্‌ই'* প্রধান। এ ছাড়াও তাঁর *'দি এথিকস্‌'*, *'দি লজিক'* ইত্যাদি পুস্তকও উল্লেখ যোগ্য। তবে *'দি পলিটিকস্‌'* গ্রন্থেই তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার মূল বিষয়গুলো বিবৃত হয়েছে। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪ অব্দে ষ্ট্যাগিরা নামক স্থানে তাঁর জন্ম এবং চালসিস নামক শহরে ৩২২ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। 'লাইসিয়্যুম' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিনি এথেন্সে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এরিষ্টটলের সময় গ্রীসের রাজনৈতিক অংগন ছিল অস্থির। প্লেটোর একাডেমিতে অধ্যয়নের সময় ও তার পরে তিনি গ্রীসের রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার সম্মূখীন হন। ক্রম:ক্ষয়িষ্ণু এই পরিস্থিতি তাঁকে ব্যথিত করেছিল। অসহনীয় এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তিনি আত্মনিয়োগ করেন। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সাথে ঐক্য ও সংহতি বিধান নিশ্চিত করাই ছিল তাঁর চিন্তার মূল লক্ষ্য। সমকালীন ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে রাজনীতি অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেছিলেন। প্লেটোর মত কোন আদর্শিক দৃষ্টিতে নয় বরং বাস্তবতার নিরিখে তিনি রাজনীতি অধ্যয়ন করেছিলেন। পরবর্তী পাঠগুলোর মধ্যে দিয়ে আমরা এরিষ্টটল পলিবিয়াস ও ফিপোকার রাষ্ট্রচিন্তার বিভিন্ন দিকের সাথে পরিচিত হতে পারি।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- ❑ *পাঠ-১ : এরিষ্টটল;*
- ❑ *পাঠ-২ : এরিষ্টটল কর্তৃক সরকারের শ্রেণী বিভাগ;*
- ❑ *পাঠ-৩ : এরিষ্টটলের দাসতত্ত্ব;*
- ❑ *পাঠ-৪: এরিষ্টটলের বিপ্লব তত্ত্ব;*
- ❑ *পাঠ-৫: রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এরিষ্টটলের অবদান;*
- ❑ *পাঠ-৬: এপিকিউবিয়ানবাদ ও ষ্টৌয়িক দর্শন;*
- ❑ *পাঠ-৭: রোমান রাষ্ট্রচিন্তা: পলিবিয়াস ও সিসেরো।*

পাঠ-১

এরিস্টটল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- এরিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তার বিভিন্ন দিকের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- এরিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তার সাথে পরিচিত হতে পারবেন;
- রাষ্ট্র সম্পর্কে এরিস্টটলের ধ্যানধারণার বর্ণনা দিতে সক্ষম হবেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তার সংগে পরিচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এরিস্টটলের রাষ্ট্র চিন্তা মূলত: তাঁর *'দি পলিটিকস্'* পুস্তকের মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়েছে। আটটি পুস্তক সমন্বয়ে রচিত এই গ্রন্থের বিন্যাসের মধ্যে যথেষ্ট বিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। তাই কেউ কেউ মনে করেন যে, এটি সমগ্র কোন গ্রন্থের একটি ভূমিকা বিশেষ। প্লেটোর ন্যায় এরিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তা প্রধানত: নগর রাষ্ট্র কেন্দ্রিক। এরিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তার সাথে পরিচিত হওয়ার আগে রাষ্ট্রনীতি অধ্যয়নে তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি জানা দরকার। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষণপূর্বক বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে সমস্ত কিছু যাচাই এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণই হলো তাঁর পদ্ধতির মূল কথা। এ ধরনের পদ্ধতিকে আরোহী পদ্ধতি (inductive method) বলা হয়।

নিম্নে এরিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তার মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

এরিস্টটল বিশ্বাস করতেন, একমাত্র রাষ্ট্রের মাধ্যমেই মানুষ সর্বোৎকৃষ্ট নৈতিক জীবন যাপন করতে সক্ষম

প্লেটোর ন্যায় এরিস্টটল নীতিশাস্ত্র ও রাষ্ট্রনীতির মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার একটি বিশেষ দিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে রাষ্ট্রনীতিকে তিনি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে 'রাষ্ট্রই হচ্ছে মানুষের সর্বোচ্চ সংস্থা–রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই সংস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে, তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান।' তবে অধ্যাপক স্যাবাইনের অভিমত অনুযায়ী বলা যায় যে, নীতিশাস্ত্র এবং রাষ্ট্রনীতির সম্পর্কের প্রশ্নে এরিস্টটল প্লেটোর অনুসৃত ধারা থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। এ কারণে উভয়ের রাষ্ট্রচিন্তায় নীতিশাস্ত্র এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। এরিস্টটল বিশ্বাস করতেন, একমাত্র রাষ্ট্রের মাধ্যমেই মানুষ সর্বোৎকৃষ্ট নৈতিক জীবন যাপন করতে সক্ষম।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি

রাষ্ট্র বিবর্তনের ফল। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে রাজনৈতিক জীব

পূর্বসুরীদের মত এরিস্টটলও মনে করতেন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সর্বোৎকৃষ্ট বিকাশ রাষ্ট্রের মাধ্যমেই ঘটে থাকে। এরিস্টটল আরও মনে করতেন মানুষের প্রকৃতির বিবর্তনের মধ্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি নিহিত। অর্থাৎ প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক উপায়ে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের স্বভাবগত প্রবৃত্তি হল রাষ্ট্রে বসবাস করা। কারণ 'মানুষ প্রকৃতিগতভাবে রাজনৈতিক জীব।' প্রকৃতি প্রদত্ত এই প্রবণতাই মানুষকে রাষ্ট্র নামক সংগঠন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করেছে। অন্যান্য জীবের মত মানুষ শুধু বেঁচে থেকেই সন্তুষ্ট নয়,মানুষ যুক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে উত্তম ভাবে বেঁচে থাকতে চায়। এ প্রবণতার জন্যই মানুষ সংগঠন তৈরী করে থাকে। এরিস্টটলের মতে,'রাষ্ট্র ব্যক্তি ও সংঘের পূর্ববর্তী।' তিনি বলতে চান রাষ্ট্র ব্যতীত ব্যক্তির অস্তিত্ব চিন্তা করা যায় না। ব্যক্তির পক্ষে রাষ্ট্রের বাইরে

থাকা সম্ভব নয়। ব্যক্তি বা অন্যান্য সংঘ রাষ্ট্রের মধ্যে থাকে। রাষ্ট্র একটি পূর্ণাঙ্গ সত্তা। মানবদেহের যেমন বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকে এবং তাদের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ দেহ গঠিত হয়, তেমনি রাষ্ট্রের মধ্যে থাকে ব্যক্তি, সংঘ ইত্যাদি। একটির অনুপস্থিতিতে যেমন দেহ পূর্নাঙ্গতা লাভ করতে পারে না, ঠিক তেমনি ব্যক্তি বা সংঘ ব্যতীত রাষ্ট্র পূর্ণ হতে পারে না। আবার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে যেমন কোন বিশেষ অঙ্গ অর্থহীন হয়ে যায়, তেমনি রাষ্ট্র থেকে ব্যক্তি বা সংঘ বিচ্ছিন্ন হলে তার আর অস্তিত্ব থাকে না। রাষ্ট্র সম্পর্কে এরিস্টটলের জৈব ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে এরিস্টটল বলেছেন যে, মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনের শুরু হয়েছিল পরিবার গঠনের মধ্যে দিয়ে। তিনি আরও বলেন' 'পরিবার গঠনের পেছনে কোন বহি:শক্তি কাজ করে নি।' কারণ পুরুষ ও নারীর একত্র বসবাস করার প্রবণতা প্রকৃতি প্রদত্ত। কিন্তু পরিবার মানুষের জীবনের ব্যাপক ও বহুমুখী সমস্যার মধ্যে সীমিত কিছু মেটাতে পারে মাত্র। তাই আরও প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে মানুষ স্বাভাবিকভাবে কিছু পরিবার নিয়ে গ্রাম বা সমিতি গঠন করলো। পরবর্তীতে মানুষ দেখলো তার চেয়েও উন্নত সংঘ প্রয়োজন, কারণ মানুষ পূর্ণতা চায়। আর চূড়ান্ত পূর্ণতার লক্ষ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই এলো রাষ্ট্র। তিনি বিশ্বাস করতেন কেবল রাষ্ট্রই মানুষকে পূর্ণতা দিতে সক্ষম। তাঁর মতে রাষ্ট্র একটি "স্বয়ংসম্পূর্ণ" একক বিশেষ।

মানুষ যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতো তাহলে পরিবার, গ্রাম, সংঘ বা রাষ্ট্র কোন সংগঠনেরই প্রয়োজন হতো না। মানব প্রকৃতির এই অ-স্বয়ংসম্পূর্ণতা, উত্তমের প্রতি প্রতিনিয়ত আকাংখা, ইত্যাদিই হলো রাষ্ট্রের সৃষ্টির মূল কারণ। এরিস্টটল সমসাময়িক বিপরীত চিন্তাবিদ তথা সফিষ্ট সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রের উৎপত্তি তত্ত্ব -'রাষ্ট্র একটি কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান'কে অসার প্রমাণ করতে গিয়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ে একটি বাস্তবসম্মত এবং যুক্তিপূর্ণ তত্ত্বের অবতারনা করেছেন।

সমালোচনা

প্রকৃতপক্ষে বহুধর্মী উপাদানের মিলনের ফলেই রাষ্ট্রের আর্বিভাব হয়েছে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে এরিস্টটল কতকগুলো পূর্বানুমানের আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন, প্রথমত: রাষ্ট্র স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ পরিবার, সমিতির উৎপত্তি স্বাভাবিক। এবং এদের থেকেই উদ্ভুত হয়েছে রাষ্ট্র। দ্বিতীয় পূর্বানুমান হলো রাষ্ট্র একটি 'স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সমালোচকেরা তাঁর এ দু'টি ধারণার সাথে সম্পূর্ণ একমত হতে পারেন নি। তারা বলতে চান রাষ্ট্রের উৎপত্তি স্বাভাবিক হলেও সেই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে সম্মতি, ধর্ম, রক্তের সম্পর্ক এমনকি বল প্রয়োগ ইত্যাদিরও অবদান আছে। ইতিহাস তার স্বাক্ষ্য দেয়। প্রকৃতপক্ষে বহুধর্মী উপাদানের মিলনের ফলেই রাষ্ট্রের আর্বিভাব হয়েছে।

পরিবার থেকে রাষ্ট্রের যাত্রা শুরু হয়েছে বলে এরিস্টটল ধারণা করেছেন। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে হয়তো তার এ ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। পরিবার গঠনের পর্যায়ে উপনীত হওয়ার পূর্বেও হয়তো মানুষ কোন না কোন ভাবে জীবন যাপন করতো। এই প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়ের সাথে সমন্বয়হীনতা তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বকে প্রশ্নবোধক করে তুলেছে।

তাঁর জৈবতত্ত্ব তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে। রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে বিলীন- এরূপ ধারণা সত্য নয়। জৈব তত্ত্বের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়ে তিনি রাষ্ট্র, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যেকার পার্থক্য ভুলে গিয়েছেন। ফলে তার তত্ত্বে গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে তাঁর এই তত্ত্বের মধ্য দিয়ে মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের স্থায়ী চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং রাষ্ট্র সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণার যুক্তিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে এটি একটি মৌলিক সংযোজন। পরবর্তী পাঠসমূহের ভেতর দিয়ে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার অন্যান্য দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

সারকথা:

এরিস্টটলকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। 'দি পলিটিক্স' গ্রন্থে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার মূল বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। এরিস্টটল রাষ্ট্রকে একটি স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক প্রতিষ্ঠান বলে বর্ণনা করেছেন। মানুষের যুক্তিবাদী চিন্তাচেতনার নিরিখে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজনে রাষ্ট্র খুব স্বাভাবিক ভাবেই পরিবার সমাজ ইত্যাদির ভেতর দিয়ে উৎপত্তি লাভ করেছে। রাষ্ট্রকে তিনি একটি জৈবিক সত্তার সাথে তুলনা করেছেন। মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে রাজনৈতিক জীব ভেবেছেন এবং আরও বলেছেন যে, রাষ্ট্রের বাইরে মানুষের জীবন যাপন সম্ভব নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। এরিস্টটলের জন্মস্থান কোথায়?
(ক) এথেন্স; (খ) স্পার্টা;
(গ) মেসিডোনিয়া; (ঘ) ষ্টাগিরা।

২। *দি পলিটিকস* পুস্তকের লেখক কে?
(ক) প্লেটো; (খ) এরিস্টটল;
(গ) সক্রেটিস; (ঘ) সফিষ্ট সম্প্রদায়।

৩। 'রাষ্ট্র একটি কৃত্তিম সংগঠন' এটি কার উক্তি?
(ক) প্লেটোর; (খ) এরিস্টটলের;
(গ) সফিষ্ট সম্প্রদায়ের; (ঘ) সক্রেটিসের।

৪। রাষ্ট্র একটি প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক সংগঠন-কারণ :-
(ক) রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি; (খ) রাষ্ট্র একটি চুক্তির ফল;
(গ) মানুষ স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিকভাবে রাজনৈতিক জীব:
(ঘ) রাষ্ট্র বল প্রয়োগের দ্বারা সৃষ্ট।

সঠিক উত্তর ১। ঘ ২। খ ৩। গ ৪।গ

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। এরিস্টটল কি ভাবে সমসাময়িক গ্রীক রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন?
২। আরোহী পদ্ধতি কি?
৩। রাষ্টের জৈব ধারণা কি?
৪। কি ভাবে পরিবার ও সমবায় থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় এবং কেন?

খ) রচনামূলক প্রশ্ন:

১। সমালোচনাসহ রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কে এরিস্টটলের তত্ত্ব আলোচনা করুন।
২। 'রাষ্ট্র ব্যক্তি ও সংঘের পূর্ববর্তী'-এরিস্টটলের এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা কি? আলোচনা করুন।

পাঠ-২

এরিস্টটল কর্তৃক সরকারের শ্রেণীবিভাগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- এরিস্টটল কর্তৃক সরকারের শ্রেণী বিভাগের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- এরিস্টটল কর্তৃক সরকারের শ্রেণীবিভাগ জানার মাধ্যমে তুলনামূলক রাজনীতির ভিত্তি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

সরকারের শ্রেণী বিভাগ রাজনীতি অধ্যয়নের বিশেষত: তুলনামূলক রাজনীতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক। এরিস্টটল তৎকালীন সময়ের প্রায় ১৫৮টি দেশের সংবিধান সংগ্রহ করে সেগুলো পর্যালোচনা করেছিলেন এবং একটি উত্তম সংবিধান বা সরকার ব্যবস্থার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। *‘দি পলিটিকস্’* গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে এরিস্টটল বিভিন্ন ধরনের সংবিধান, সরকার এবং তাদের শ্রেণীবিভাজন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

এরিষ্টটলের নিকট রাষ্ট্র, সংবিধান ও সরকার সব ছিল অভিন্ন।

এরিস্টটল কর্তৃক প্রদত্ত সরকারের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই একটি বিষয় সম্পর্কে পরিস্কার হওয়া দরকার, তা হলো আধুনিক কালে আমরা সরকার, রাষ্ট্র, সংবিধান প্রভৃতি প্রত্যয়গুলোকে স্বতন্ত্র মনে করি এবং পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করে থাকি। কিন্তু এরিস্টটল এগুলোকে অভিন্ন মনে করতেন না। তিনি এ প্রত্যয়গুলো আলাদাভাবে বিচার বিশ্লেষণ করেন নি। এর কারণ সম্ভবত: তৎকালীন গ্রীসের রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে নিহিত। তাঁর সমসাময়িক গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলোতে ধনিকতন্ত্র (Oligarchy) এবং গণতান্ত্রিকদের (Democracy) মধ্যে ক্ষমতার প্রতিনিয়ত অদল বদল হতো। আর প্রায়শই তা হতো চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার ভেতর দিয়ে। উপরোক্ত শ্রেণী দু'টির যে কোন একটি ক্ষমতাচ্যূত হলে শুধু সরকার নয়, রাষ্ট্রের চরিত্র বা প্রকৃতিই বদলে যেতো। তাই এরিস্টটলের একথা ভাববার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, সংবিধান, রাষ্ট্র ও সরকার অভিন্ন এবং এদের যে কোন একটির পরিবর্তন ঘটলে রাষ্ট্রের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। এরিস্টটল সংবিধানের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন এভাবে, ‘সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসমূহের বিন্যাসব্যবস্থা।' অন্যকথায় এরিস্টটলের মতানুযায়ী বলা যায়, সার্বভৌম নগর রাষ্ট্রের সংগঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ই সংবিধান। এরিস্টটল কর্তৃক প্রদত্ত সরকারের শ্রেণী বিভাগ কোন নতুন আবিষ্কার ছিল না। কেননা, প্লেটো তাঁর *রিপাবলিক* গ্রন্থের ৮ম পুস্তকে সরকারের যে শ্রেণী বিন্যাস করেছিলেন, এরিস্টটল তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে বলা যায়, প্লেটো যেখানে সমাপ্ত করেছিলেন এরিস্টটল সেখান থেকেই শুরু করেছিলেন।

এরিস্টটলের মতে নগর রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য প্রধানত: দু'টি। যথা-

(ক) সৎ জীবন যাপনে সাহায্য করা এবং (খ) ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি বিধান করা। সকলের অভিন্ন স্বার্থ সংরক্ষণ করাই উত্তম লক্ষ্য। কিন্তু সকল সংবিধান এ নীতিতে অবিচল থাকে না। তিনি বলেন যে, কোন কোন সংবিধানে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা সকলের অভিন্ন স্বার্থ রক্ষাকে প্রাধান্য দেন। এ জাতীয় সংবিধানই যথার্থ বা সঠিক (Real)। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থ অর্জনকে প্রাধান্য দেয়। এ জাতীয় সংবিধান হলো বিকৃত (Perverted) সংবিধান। তিনি আরও বলেছেন শাসনক্ষমতা একজন, অল্প কয়েকজন এবং বহুজনের হাতে ন্যাস্ত থাকতে পারে। সুতরাং শাসকের গুণ (অভিন্ন স্বার্থ) বা সংকীর্ণ স্বার্থ এবং শাসকের সংখ্যা (এক জন, কয়েকজন বা বহুজন) এ

শাসকের গুণ ও সংখ্যা এ দু'টি নীতির উপর ভিত্তি করেই এরিষ্টটল সরকারের শ্রেণী বিভাগ করেছেন

দুটি নীতির উপর ভিত্তি করে এরিস্টটল সংবিধান বা রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। সঠিক বা খাঁটি সংবিধানে একজন শাসক বা কয়েকজন শাসক বা বহুজন শাসক সমাজের সকলের অভিন্ন স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে শাসন পরিচালনা করেন। এরিস্টটল একজনের শাসনকে রাজতন্ত্র, অল্প কয়েকজনের শাসনকে অভিজাততন্ত্র এবং বহুজনের শাসনকে পলিটি বলেছেন। শাসকের সংখ্যা একজন, অল্প কয়েকজন বা বহুজন থাকলেও যদি উদ্দেশ্য ভিন্ন হয় অর্থাৎ তিনি বা তাঁরা যদি সকলের অভিন্ন স্বার্থের প্রত্যয় থেকে বিচ্যুত হন তবে সে অবস্থায় যে ধরনের সংবিধান পাওয়া যাবে তাকে এরিস্টটল বলেছেন বিকৃত সংবিধান। তাঁর মতে, এরূপ ক্ষেত্রে রাজতন্ত্রের বিপরীত হলো স্বৈরতন্ত্র, অভিজাতন্ত্রের বিপরীত হলো সংকীর্ণ গোষ্ঠীতন্ত্র এবং পলিটির বিপরীত হলো গণতন্ত্র। নিম্নের ছকের মাধ্যমে শ্রেণীবিন্যাসটির প্রকাশ করা যায়:

শাসকের সংখ্যা	শুদ্ধ বা স্বাভাবিক রূপ	বিকৃত রূপ
একজনের শাসন	রাজতন্ত্র	স্বৈরতন্ত্র
মুষ্টিমেয়র শাসন	অভিজাততন্ত্র	ধনিকতন্ত্র
বহুজনের শাসন	পলিটি	গণতন্ত্র

অধ্যাপক বার্কার এরিস্টটলের সংবিধান বিভাজনের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, এরিস্টটলের এ বিভাজনের মধ্য দিয়ে রাজনীতি ও অর্থনীতির সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। বিকৃত সংবিধান মূলত: অর্থনৈতিক শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার প্রতিফলন।

পলিটি বলতে তিনি একধরনের ভারসাম্য রক্ষাকারী মধ্যবিত্তের শাসন বলতে চান।

এরিস্টটল উপরোক্ত বিভাজনের মধ্যে পলিটিকে সর্বোৎকৃষ্ট বলেছেন। যদিও এটি বহুজনের শাসন, তবুও বিশেষ অর্থে পলিটি বলতে তিনি একধরনের ভারসাম্য রক্ষাকারী মধ্যবিত্তের শাসন বলতে চান। কারণ এখানে চরম প্রকৃতির ধনিকতন্ত্র ও গণতন্ত্রের ত্রুটিগুলোকে পরিহার করে তাদের গুণাবলীর মিশ্রণ ঘটানো যায়। এটি ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। তাঁর এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে দিয়ে এরিস্টটল সামগ্রীক স্বার্থকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে রাষ্ট্রের ভিত্তি মজবুত করার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। রাষ্ট্রের, সরকারের ও সংবিধানের স্বাভাবিক লক্ষ্য হলো সামগ্রীক কল্যাণ সাধন এ সত্যটি তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে ব্রতী হয়েছেন।

সমালোচনা

- গণতন্ত্রের প্রতি আক্রমনাত্মক মনোভাবের প্রকাশ ঘটায় এরিস্টটলের সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হয়েছে। তিনি গণতন্ত্রকে বিকৃত সংবিধান বলেছেন। এটি আজকাল গ্রহণযোগ্য নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত হলে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য তথা সামগ্রীক কল্যাণ সাধিত হতে পারে বলে বর্তমানে মনে করা হয়।
- রাজতন্ত্র উত্তম হতে পারে, এমন বক্তব্য বর্তমানে অচল। রাজতন্ত্র অতি সহজে স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হয়ে থাকে। তাই এখানে বিকৃতির ঝুঁকি বেশি।
- সরকার, সংবিধান ও রাষ্ট্রকে একই অর্থে ব্যবহার করাকে বর্তমানে আর যুক্তিসংগত মনে করা হয় না। বর্তমানে গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, ক্ষমতাপৃথকীকরণ ইত্যাদি ধারণাগুলোর সাথে তাঁর শ্রেণীবিন্যাস সংগতিপূর্ণ নয়।
- বর্তমানে সরকারের শ্রেণীবিভাগের প্রশ্নে শুধুমাত্র সংখ্যা ও উদ্দেশ্য বা গুণ নির্ভর বিভাজন অচল। অধুনা জটিল ধরনের জাতি রাষ্ট্রের বিভিন্নমুখী সমস্যা ও সংঘাতের

আলোকে বিভিন্ন চরিত্রের সরকারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তাই সরকার বিভাজনের মানদন্ড ভিন্নতর ও বহুমুখী।

তবে শুধুমাত্র আধুনিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এরিস্টটলের প্রতি অন্যায় করা হবে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তিনি এ বিভাজন করেছিলেন, এ কথাটি মনে রাখা আমাদের কর্তব্য।

সারকথা:

এরিস্টটল সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। তবে তাঁর কাছে সরকার, সংবিধান ও রাষ্ট্রের অর্থ ছিল অভিন্ন। তিনি সংখ্যা এবং গুণ এ দু'টি নীতির উপর ভিত্তি করে সংবিধানের শ্রেণীবিভাজন করেছেন। এটি করতে গিয়ে তিনি স্বাভাবিক রূপ যথা: নির্বিশেষে সমাজের সকলের স্বার্থ দেখা এবং বিকৃতরূপ যথা: ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালনা করাকে বুঝিয়েছেন। রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং পলিটিকে তিনি স্বাভাবিক রূপ এবং যথাক্রমে স্বৈরতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র এবং গণতন্ত্রকে বিকৃত রূপের সরকার বলেছেন। গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোন থেকে আধুনিক সমালোচকগণ এরিস্টটলের এ শ্রেণীবিন্যাসকে নানামুখী সমালোচনা করে থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (|) চিহ্ন দিন।

১। আধুনিক কালে সরকার, রাষ্ট্র এবং সংবিধানকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বুঝায় কারণ-
ক. এর ফলে গণতান্ত্রিক চেতনা উপকৃত হয়;
খ. এর ফলে স্বৈরতান্ত্রিক চেতনা উপকৃত হয়;
গ. এর ফলে অভিজাততন্ত্র উপকৃত হয়;
ঘ. এর ফলে ধনিকতন্ত্র উপকৃত হয়।

২। পলিটি স্বাভাবিক রূপ, এর বিকৃতরূপ হলো-
ক. রাজতন্ত্র; খ. অভিজাততন্ত্র;
গ. গণতন্ত্র; ঘ. স্বৈরতন্ত্র।

৩। রাজতন্ত্রে শাসক বা শাসকবর্গ 'বিকৃতভাবে শাসন করলে যে রূপ পাওয়া যায় তা হলোঃ
ক. রাজতন্ত্র; খ. অভিজাততন্ত্র;
গ. পলিটি; ঘ. স্বৈরতন্ত্র।

সঠিক উত্তর ১। ক ২। গ ৩। ঘ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। '*দি পলিটিকস্*' গ্রন্থের কোন অধ্যায়ে এরিস্টটল সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন?
২। পলিটি কি?
৩। এরিস্টটলের মতে কেন মধ্যবিত্ত দ্বারা শাসিত সরকার উত্তম?
৪। সংবিধানের শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি দু'টি কি?
৫। সংবিধানের শ্রেণীবিন্যাস করতে গিয়ে এরিস্টটল কাকে অনুসরণ করেছেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সমালোচনাসহ এরিস্টটলের সরকারের শ্রেণীবিভাগের বর্ণনা দিন।
২। সরকার সম্পর্কে এরিস্টটলের ধারণা আলোচনা করুন। তিনি কোন্ প্রকারের সরকারকে উত্তম বলে চিহ্নিত করেছেন এবং কেন?

পাঠ-৩

এরিস্টটলের দাসতত্ত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- এরিস্টটলের দাসতত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- এরিস্টটলের দাসতত্ত্বের সমালোচনা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

দাসতত্ত্ব এরিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তার এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। তবে বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। বিশেষ করে বর্তমান বিশ্বে যেখানে দৃশ্যত ও আনুষ্ঠানিক বিচারে 'সকল মানুষ সমান' এমন চিন্তা সর্বজনভাবে স্বীকৃত। আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে, এরিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তায় বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটেছিল। সমসাময়িক গ্রীক সমাজ ছিল দাস নির্ভর সমাজ। নগর রাষ্ট্রের উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে দাসের শ্রমের উপর নির্ভরশীল ছিল। এই দাসদের কোন প্রকার সামাজিক বা রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। নগর রাষ্ট্রের প্রতি তিনজনের মধ্যে দুজনই ছিল দাস। মাঝে মধ্যে দাস বিদ্রোহ নগর রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে অস্থির করে তুলতো। তাছাড়া সফিষ্ট সম্প্রদায়ের চিন্তাধারায় দাসদের সমানাধিকারের কথা বার বার উচ্চারিত হতো। উপরোক্ত রাজনৈতিক বাস্তবতার আলোকে একজন যুক্তিবাদী ও সংরক্ষণবাদী চিন্তাবিদ হিসাবে এরিস্টটল নগর রাষ্ট্রে দাস ব্যবস্থাকে শুধু সমর্থনই করেন নি, এর পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে গিয়েছেন।

নগর রাষ্ট্রের উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে দাসের শ্রমের উপর নির্ভরশীল ছিল।

এরিস্টটল তাঁর '*দি পলিটিকস্*' পুস্তকের ১ম অধ্যয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি [পূর্ববর্তী পাঠ দ্রষ্টব্য] এরিস্টটল তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় পরিবারকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। পরিবার থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গার্হস্থ্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কথা বলেছেন। গার্হস্থ্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার একটি অপরিহার্য উপকরণ হিসাবে তিনি দাস এবং দাসব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে এরিস্টটল আইনগত, নৈতিক, অর্থনৈতিক বিবিধ যুক্তির অবতারণা করেছেন।

- তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, দাসরা জৈব বা সজীব যন্ত্রপাতির সামিল (Animate tools)। তিনি বলতে চান গৃহস্থালী কাজের জন্য কিছু উপকরণের দরকার। আর এ সব উপকরণ দু' প্রকার–যথা অজৈব (inanimate tools) ও জৈব উপকরণ (animate tools)।

  তাঁর যুক্তিতে দা কূড়াল ইত্যাদি যেমন 'অজৈব যন্ত্রপাতি' তেমনি গৃহস্থালী কাজের জন্য গৃহপালিত পশু, দাস ইত্যাদি 'জৈব যন্ত্রপাতি।' এগুলো মূলত: জীবন্ত সম্পদ। এ সব হাতিয়ার (instrument) ব্যতীত গৃহস্থালী কার্য সম্পাদন সম্ভব নয়। অর্থাৎ এরিস্টটলের মতে গৃহস্থালী পশু ও দাসের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। পশুর যেমন যুক্তিবোধ নাই, দাসেরও তেমনি যুক্তিবোধ নাই। আর এ জন্যই তারা দাস। এ কারণে, তাদের নিজস্ব সত্তা ও স্বাধীনতা থাকার কোন অর্থ নাই। সুতরাং সফিষ্ট সম্প্রদায়ের যুক্তির বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে এরিস্টটল বলতে চান, দাস ব্যবস্থা স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক, তথা কৃত্রিম নয়।

দাস ব্যবস্থা স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক, তথা কৃত্রিম নয়।

- এ প্রসঙ্গে এরিস্টটল যুক্তির অবতারনা করেছেন এ ভাবে যে, সব সময়ই কোন গঠিত সমগ্রের সেই অংশ কর্তৃত্ব করে থাকে যে অংশ উৎকৃষ্ট। এরিস্টটল বলতে চান যে, প্রকৃতিগতভাবে সকল মানুষ সমান নয়। কিছু লোক জ্ঞান বা প্রজ্ঞার অধিকারী এবং উক্ত প্রজ্ঞার কারণে তারা শুধু আদেশ দানেরই উপযুক্ত। অন্যদিকে অধিকাংশ লোক

উত্তমের অধীনে অধমের থাকার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নাই।

শুধুমাত্র দৈহিক শক্তির বলে শক্তিমান। তারা শুধুমাত্র হুকুম তামিল করার উপযুক্ত। প্রজ্ঞার অভাব আছে বলে এরা হুকুম দানে অক্ষম। অন্য কথায় প্রভু তাঁরা যারা জ্ঞানী এবং দাস তারা যারা প্রজ্ঞাবানের আদেশ মান্য করে। প্রভুরা মস্তিস্ক ও আত্মা দ্বারা চালিত হয়। আর দাসেরা দেহ বা আবেগ দ্বারা চালিত হয়। দেহ প্রজ্ঞার অধীনে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। উত্তমের অধীনে অধমের থাকার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নাই।

- এরিস্টটল উন্নত ও নৈতিক জীবন যাপনের লক্ষ্যের সাথে দাস ব্যবস্থাকে এক করে দেখেছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, প্রভুদের যদি গৃহস্থালী কাজে ব্যাপৃত থাকতে হয়, তবে উন্নত জীবন নির্দেশনার জন্য তারা পর্যাপ্ত সময় 'অবসর' পাবেন না। তাই রাষ্ট্রের পরম লক্ষ্য তথা উন্নত নৈতিক জীবন অর্জনের নিমিত্তে দাসব্যবস্থা অপরিহার্য।

দাস প্রথাটি দাস, প্রভু এবং নগর রাষ্ট্র সবার জন্যই কল্যাণকর

- এরিস্টটল যুক্তি দেখিয়েছেন যে, দাসদের কল্যাণার্থেই তাদের দাস হয়ে থাকা উত্তম। কেননা প্রজ্ঞার অভাব থাকায় তাদের পক্ষে স্বাধীন ও মানবীয় সুস্থ্য জীবন যাপন সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় প্রভুর অধীনে থেকে তাঁর গুণাবলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দাসেরা নৈতিক উৎকর্ষ লাভ করতে পারে। এমন হলে একদিকে দাসরা মুক্ত মানুষ হতে পারে, অন্যদিকে প্রভুরা দাসের উপর উৎপাদনের ভাব ছেড়ে দিয়ে উন্নত জীবন রচনায় মনোনিবেশ করতে পারে। সুতরাং দাস প্রথাটি দাস, প্রভু এবং নগর রাষ্ট্র সবার জন্যই কল্যাণকর। তবে এ প্রসঙ্গে তিনি বলতে চান যে, দাসদের উপর উৎপাদনের ভার ছেড়ে দিয়ে অবসরকে যদি প্রভুরা সদ্ব্যবহার না করেন তবে দাস ব্যবস্থার কোন নৈতিক ভিত্তি থাকে না। তিনি বলতে চান দাসদের সৃষ্ট অবসরকে প্রভুরা যদি উন্নত জীবন রচনায় ব্যবহার করতে না পারেন, তবে ঐ সব প্রভুরা প্রভু থাকার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন। মোট কথা এরিস্টটল দাস ব্যবস্থাকে প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক, অকৃত্রিম এবং নগর রাষ্ট্র ও মানুষের জন্য কল্যাণকর একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

সমালোচনা

এরিস্টটল 'দাস ব্যবস্থা' সমর্থন করে তার পক্ষে অত্যন্ত জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু তৎকালে এবং বর্তমানে তাঁর এ তত্ত্ব বিপুলভাবে সমালোচিত হয়েছে।

- এরিস্টটলের এ তত্ত্ব মানবতা বিরুদ্ধ। সমতার নীতিকে তিনি অস্বীকার করে সার্বজনীন মানবতার বিরুদ্ধে কথা বলে গিয়েছেন।
- তিনি যে নীতির ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভাজন করতে চেয়েছেন, তাও খুব যুক্তিযুক্ত নয়। 'মানুষ মাত্রই যুক্তিবাদী এবং পূণ্যের প্রতি অনুরক্ত'-এ বানীই সত্যবানী বলে তৎকালীন সংশয়বাদী ও ষ্টোয়িকবাদীরা প্রচার করে গিয়েছেন। বলাবাহুল্য, বর্তমান কালেও এরূপ দর্শনই সর্বজন স্বীকৃতি পেয়েছে।
- দাসদেরকে পশু ও গৃহস্থালী যন্ত্রপাতির সাথে তুলনা করে এরিস্টটল গোঁড়া ও রক্ষণশীল দৃষ্টিভংগির পরিচয় দিয়েছেন।
- দাসতত্ত্বের ভেতর দিয়ে তার গ্রীক অহংবোধের সংকীর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। কারণ, গ্রীকরা দাস হতে পারে না, এমন কিছু বক্তব্যও তিনি দিয়েছেন।
- তৎকালীন গ্রীক নগর রাষ্ট্রে দাসদের মধ্যে যে উপর্যুপরী বিদ্রোহ সংঘটিত হতো তা তাঁকে কিছুটা বিব্রত করে তুলেছিল। তিনি সফিষ্ট সম্প্রদায়ের মত প্রগতির পথে চিন্তা না করে রক্ষণশীল দৃষ্টিভংগিতে দর্শন ও যুক্তির মাধ্যমে তা প্রতিহত করে ক্রম:ক্ষয়িষ্ণু গ্রীক সমাজের মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করতে চেয়েছেন। তবে এ কথা বলা যায় যে, সমতা ও মানবতার দৃষ্টিকোন থেকে এরিস্টটলের দাসতত্ত্ব প্রতিক্রিয়াশীল দর্শন বলে মনে হলেও এবং আধুনিক যুগে তা দৃশ্যত নিন্দনীয় হলেও বাস্তবে বর্তমানে আমরা কি দেখি? মানবতার নামে বিত্তহীন মানুষ এখনও সমাজের উচ্চবিত্ত ও ধনীদের ইচ্ছার

দাস। সুতরাং এরিস্টটল অবাস্তব চিন্তা করেছিলেন, এমন কথা বলার কোন ভিত্তি নাই।

সারকথা:

তৎকালীন গ্রীসের সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে এরিস্টটল দাস ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছিলেন। সফিস্ট সম্প্রদায়ের বিপরীত প্রান্তে অবস্থান নিয়ে এরিস্টটল দাস ব্যবস্থাকে নৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে যথার্থ বলেছেন। তা'ছাড়া আইনগত দৃষ্টিকোন থেকে বৈধ বলেছেন এবং দাস ব্যবস্থাকে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক বলে গণ্য করেছিলেন। তবে তার এ তত্ত্ব বর্তমানের সার্বজনীন মানবতার দৃষ্টিকোন থেকে নানাভাবে সমালোচনা করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। এরিস্টটলের সমসাময়িক গ্রীক সমাজ ছিল–
(ক) ধনতান্ত্রিক;
(খ) দাসভিত্তিক;
(গ) সমাজতান্ত্রিক;
(ঘ) সামন্ততান্ত্রিক।

২। এরিস্টটল দাসব্যবস্থাকে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক বলে মনে করতেন, কারণ–
(ক) মানুষ সকলেই সমান;
(খ) মানুষে মানুষে জ্ঞানে বা প্রজ্ঞার পার্থক্য আছে;
(গ) অধিকাংশ দাস ছিল অ-গ্রীক;
(ঘ) দাসব্যবস্থা গ্রীক সমাজে প্রচলিত ছিল।

৩। এরিস্টটল দাসদেরকে মনে করতেন–
(ক) সজীব যন্ত্রপাতির সামিল;
(খ) বুদ্ধিমান প্রাণী;
(গ) শাসক হওয়ার মত যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ;
(ঘ) হুকুম তামিল করার যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ।

সঠিক উত্তরঃ ১। খ ২। খ ৩। ক

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১। দাস সমাজ কি?
২। নৈতিকতার দৃষ্টিতে কেন এরিস্টটল দাসব্যবস্থা সমর্থন করেছিলেন?
৩। দাসব্যবস্থা সম্পর্কে সফিষ্ট সম্প্রদায় কি দৃষ্টিভংগি পোষণ করতেন?
৪। এরিস্টটলের দাসতত্ত্ব সম্পর্কে বর্তমান দৃষ্টিতে কি কি সমালোচনা আছে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। এরিস্টটলের দাসতত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
২। সমালোচনাসহ এরিস্টটলের দাসতত্ত্ব আলোচনা করুন।

পাঠ-৪

এরিস্টটলের বিপ্লবতত্ত্ব

এই পাঠ শেষে আপনি–

- এরিস্টটলের বিপ্লবতত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- এরিস্টটলের মতে বিপ্লবের কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিপ্লব দমনের উপায়সমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পূর্বের পাঠ থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, এরিস্টটলের সমসাময়িক গ্রীক নগর রাষ্ট্রসমূহে প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করতো। ঘন ঘন সরকার ও সংবিধান পরিবর্তন, সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনকে অস্থির করে তুলেছিল। বলাবাহুল্য, এ অবস্থা এরিস্টটলের মত একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে বিষয়টি সম্পর্কে ভাবিয়ে তুলেছিল। এরিস্টটল গভীর ভাবে তাঁর অভিজ্ঞানবাদী পদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ পূর্বক বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেন এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তিনি প্রায় ১৫৮টি দেশের সংবিধান সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেগুলো নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। এ ভাবেই তিনি তাঁর বিপ্লবতত্ত্ব দাঁড় করেছিলেন। এ তত্ত্বে তিনি বিপ্লবের কারণ এবং তা নিরসনের উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আধুনিক যুগে বিপ্লব বলতে আমরা বুঝি সমাজের আমূল পরিবর্তন। যেমন ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব ইত্যাদি। এরিস্টটল কিন্তু বিপ্লব বলতে এর আধুনিক অর্থ বোঝান নি। তাঁর কাছে বিপ্লবের অর্থ ছিল ভিন্ন। এরিস্টটল 'বিপ্লব' শব্দটি ব্যাপক ও সাধারণ অর্থে ব্যবহার করেছেন। সরকার পরিবর্তন, সংবিধান পরিবর্তন, শাসক শ্রেণীর পরিবর্তনকে তিনি বিপ্লব অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাই তাঁর কাছে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও উপরোক্ত পরিবর্তনই ছিল বিপ্লব। বিপ্লব কেন হয়? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে এরিস্টটল বিপ্লবের কারণগুলোকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন সাধারণ কারণ ও বিশেষ কারণ।

বিপ্লবের আধুনিক অর্থ এবং এরিষ্টটলের কাছে বিপ্লবের অর্থ এক নয়

সাধারণ কারণ: বিপ্লবের সাধারণ কারণকে এরিস্টটল মনস্তাত্ত্বিক, মুনাফা ও সম্মান এবং প্রাথমিক অবস্থান এ ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

মনস্তাত্ত্বিক উদ্দেশ্য: এরিস্টটল মনে করতেন যেকোন ধরনের সংবিধানে ন্যায়বিচার সম্পর্কিত ধারণাটি সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত। তবে অর্থ ও এর প্রয়োগ সর্বত্র সমান নয়। এ রূপ পরিস্থিতিতে অর্থাৎ ন্যায়বিচারের ধারণা ও বাস্তবে এর প্রয়োগের মধ্যে যে তফাৎ থাকে বস্তুত: তাই নাগরিকদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিপ্লবের বীজ হিসাবে কাজ করে থাকে। *পলিটিকস্* পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ে এরিস্টটল বিষয়টি পরিস্কারভাবে তুলে ধরেছেন। ন্যায়বিচার থেকে যারা বঞ্চিত তারা মনে করেন যে, সমাজে অসাম্য বিরাজ করছে। অতত্রব সাম্য প্রতিষ্টার জন্য তারা প্রবৃত্ত হন। তারা বিপ্লবী হয়ে ওঠেন। সুতরাং ন্যায়বিচারের নামে এবং অসাম্যই বিপ্লবের প্রধান কারণ। উদাহরণ স্বরূপ, ক্ষমতায় নাই এমন ব্যক্তিরা মনে করেন যে, ক্ষমতাসীনরা যোগ্যতায় তাদের চাইতে হীন। সুতরাং তারা ক্ষমতা লাভের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। যখন ধনিকতন্ত্র থাকে তখন গণতান্ত্রীরা সাধারণত এরূপ মনে করার জন্যই বিপ্লবী হয়ে ওঠেন। আবার বিপরীতভাবে ধনিকতন্ত্রীরা মনে করেন যে, জ্ঞানে, গুণে, সম্পদে তারা অন্যান্যদের চেয়ে উন্নত কিন্তু অধিকার ভোগ করেছেন অন্যান্যদের মত। এই মনোবৃত্তির বশবর্তী হয়ে তারা মর্যাদা পাওয়ার জন্য বিপ্লবী হয়ে ওঠেন।

ন্যায়বিচার সম্পর্কিত ধারণা মনস্তাত্ত্বিভাবে মানুষকে বিপ্লবী করে তোলে

- সম্মান ও মুনাফা: রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে মুনাফা ও সম্মান লাভের বাসনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। তাই কখনও কেউ কেউ মুনাফা ও সম্মান লাভের

প্রত্যাশায় পরিবর্তন আনতে চান। আবার বিপরীত ভাবে মুনাফা ও সম্মানহানিকে রোধ করার নিমিত্তেও মানুষ বিপ্লবী হয়ে উঠতে পারে।

- প্রাথমিক অবস্থান: প্রাথমিক অবস্থান অনেক সময় বিপ্লবের সাধারণ কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঔদ্ধত্য, ভয়, ঘৃণা, রাষ্ট্রের কোন অংশের অ-আনুপাতিক বৃদ্ধি, অবহেলা, নির্বাচনী ষড়যন্ত্র, জনমতকে উপেক্ষা করা, রাষ্ট্রের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা প্রভৃতি কারণে বিপ্লব ঘটতে পারে। বিপ্লবের বিশেষ কারণ বলতে এরিস্টটল বিশেষ সংবিধান বা সরকার ব্যবস্থায় যে কারণে বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে তাকে বুঝাতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে এরিস্টটল গভীরভাবে চিন্তা করে নিম্নোক্ত উদাহরণ দিয়েছেন, যেমন শাসন ক্ষমতা যখন গণতন্ত্রীদের হাতে থাকে তখন তাদের জনপ্রিয় নেতারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন। এ অবস্থায় তারা ধনীদের উপর আক্রমনাত্মক মনোভাব পোষণ করেন। ফলে ধনীরা তাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে বিপ্লবী তৎপরতায় লিপ্ত হন। সাধারণত: এ ব্যবস্থায় 'গণবক্তারা' বার বার কথামালার মাধ্যমে ধনীদের উপর আক্রমণ চালান। রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রধানত দুটি কারণে বিপ্লব ঘটে থাকে, যেমন-রাজপরিবারের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বিরোধ এবং রাজাদের স্বেচ্ছাচার। নির্বিচার স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদে জনগণ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে স্বেচ্ছাচারী শাসনের অবসান ঘটাতে চান। অভিজাততন্ত্রে এক পর্যায়ে অভিজাততন্ত্রীরা আরও বিত্তের লোভে জনগণকে শোষণ করে। ফলে জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাছাড়া সম্পদ ও পদ ভাগাভাগি নিয়েও অভিজাত শাসকদের মধ্যে অর্ন্তকলহ অনেক সময় বিপ্লবে রূপ নিয়ে থাকে। পলিটি ধরনের শাসন ব্যবস্থা গণতন্ত্র ও ধনিকতন্ত্রের ভারসাম্য সম্পর্কিত কিছু দুর্বল দিকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ ভারসাম্যের হেরফের হলেই বিপ্লব ঘটে যায়। তবে এরিস্টটলের মতে অন্যান্য ব্যবস্থার চেয়ে এই ব্যবস্থাটি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী (Stable)।এভাবে এরিস্টটল বিজ্ঞানসুলভভাবে রাজনৈতিক পরিবর্তন ও বিপ্লবের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

বিপ্লব প্রতিকারের উপায়: এরিস্টটল বিপ্লবের কারণ অনুসন্ধান করেই খান্ত ছিলেন না, কিভাবে বিপ্লব প্রতিরোধ করা যায়, সে সম্পর্কে তিনি কতিপয় মূল্যবান সুপারিশ করে গেছেন। যেমন:

- তিনি বলেছেন সরকার যেনো কোন ক্রমেই জনগণকে প্রতারণা না করে। জনগণের আস্থা অর্জন করা হবে শাসক বা শাসকদের অন্যতম লক্ষ্য। কারণ প্রতারিত জনগণ প্রতারণাকারী শাসককে কখনও ক্ষমা করে না।

- আইন লংঘন ও বিশৃঙ্খলাকে যথাসম্ভব মোকাবিলা করা উচিত। কারণ এ সব ছোট খাট বিষয় পুঞ্জিভুত হয়ে ব্যাপক আকার ধারণ করে থাকে।

- শাসক ও শাসিতের মধ্যে সু-সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য শাসককে যত্নবান হতে হবে। শাসিত থেকে শাসকের বিচ্ছিন্নতাবোধ নানাভাবে সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। উভয়ের মধ্যে সু-সম্পর্ক ও সেতুবন্ধন বিপ্লব নিবারণের অন্যতম কার্যকর উপায়।

- শাসককে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে প্রভাবশালী ও অভিজাত ব্যক্তিরা সন্তুষ্ট থাকেন। কারণ, প্রভাবশালীরা সহজে অন্যান্যদেরকে বিপ্লবের পথে সংগঠিত করতে পারেন। উপরোক্ত শ্রেণীর উপর কড়া নজর রাখা দরকার।

- গণতন্ত্রীদের উচিত ধনীদের প্রতি সম্মান দেখানো, আবার ধনিকতন্ত্রীদের উচিত সর্বসাধারণের অধিকারের প্রতি যত্মবান থাকা। রাষ্ট্রের সকল শ্রেণী ও অঞ্চলের সম উন্নয়নের চেষ্টা করা দরকার। কারণ একটি রাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন বৈষম্য বিপ্লব ডেকে আনে।

- বৈষম্যমূলক ভাবে কাউকে অধিক সম্মান না দেখিয়ে বেশি সংখ্যক ব্যক্তিকে সম্মান দিতে হবে। ফলে সকলে মনস্তাত্ত্বিকভাবে সরকারের প্রতি অনুগত থাকবে।
- সরকারী কর্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণ থেকে বিরত রেখে বিপ্লব প্রতিরোধের কথা এরিস্টটল বলেছেন। কারণ সরকারী কর্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণ প্রবণতা জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে থাকে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এরিস্টটল আজ থেকে আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বিপ্লব সম্পর্কে যে তত্ত্ব দিয়েছিলেন তার অধিকাংশই বর্তমান কালের জন্যও প্রযোজ্য ও ক্রিয়াশীল।

সারকথা:

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটল তাঁর বিপ্লব তত্ত্বের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক পরিবর্তন তথা সরকার বদল, সংবিধান বদলকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি সাধারণ ও বিশেষ এ দুভাবে বিপ্লবের কারণকে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বিপ্লব দমনের জন্য কতিপয় সুপারিশও উপস্থাপন করেছেন। তাঁর এ ব্যাখ্যা বর্তমান কালের জন্য প্রযোজ্য বলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। এরিস্টটল কতগুলো দেশের সংবিধান সংগ্রহ করেছিলেন?

(ক) ১৫০টি; (খ) ১৫৮টি; (গ) ১০০টি; (ঘ) ৫০টি।

২। এরিস্টটলের নিকট বিপ্লবের অর্থ ছিল–

(ক) সামজের আমূল পরিবর্তন;

(খ) দরিদ্র শ্রেণীর ক্ষমতায়ণ;

(গ) শোষিত মেহনতী জনতার বিজয়;

(ঘ) সরকার, সংবিধান বা শাসকদের যে কোন প্রকার পরিবর্তন।

সঠিক উত্তর ১। খ ২। ঘ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন।

১। আধুনিক অর্থে বিপ্লব কি?

২। এরিস্টটল বিপ্লব বলতে কি বুঝিয়েছেন?

৩। এরিস্টটলের মতে বিপ্লবের কারণ কত প্রকার?

৪। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন্ শ্রেণী বিপ্লবী হয়ে ওঠে এবং কেন?

৫। বিপ্লব দমনের প্রধান তিনিটি উপায় কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। এরিস্টটলের মতে বিপ্লব কি? কেন বিপ্লবের উৎপত্তি হয়?

২। এরিস্টটলের মতে বিপ্লবের কারণ এবং তা দমন করার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করুন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এরিস্টটলের অবদান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- এরিস্টটলের অবদানের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- এরিস্টটল হলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক' এ উক্তিটির সত্যতা মূল্যায়ন করতে পারবেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এরিস্টটলের অবদান উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। এরিস্টটলকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। এ বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণের দাবী রাখে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাঁর অবদানসমূহ পরীক্ষা করে এ বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করা যায়। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে গ্রীসের নগর রাষ্ট্রের বাস্তবতার নিরিখে তিনি রাজনৈতিক বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন। কিন্তু কালের আবর্তে তাঁর কিছু কিছু চিন্তা ভাবনা বর্তমানেও বজায় আছে। সম্ভবতঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এরিস্টটলই সবচেয়ে বেশি কালোত্তীর্নের মর্যাদা পেয়েছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানসমূহ নিম্নরূপ:

এরিষ্টটল ছিলেন বাস্তববাদী রাষ্ট্রচিন্তাবিদ

- এরিস্টটলই রাজনীতি বিজ্ঞানকে সর্ব প্রথম একটি 'স্বতন্ত্র' (independent) মর্যাদায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর দীক্ষাগুরু প্লেটোর রাষ্ট্রচিন্তা ছিল দার্শনিকোচিত (philosophical) অর্থাৎ বাস্তব অবস্থা নয় বরং 'কি হওয়া উচিত' এটিই ছিল প্লেটোর মূল জিজ্ঞাসা। এ ছাড়া নীতিশাস্ত্রকে সর্বাধিক মর্যাদা দিয়ে প্লেটো রাষ্ট্রনীতিকে নীতিশাস্ত্রের অধীনস্থ করেছেন। ফলে, প্লেটোর হাতে রাষ্ট্রনীতি কোন পৃথক ও স্বাধীন মর্যাদা পায় নি। কিন্তু এরিস্টটল রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বলেছেন Master science 'প্রভুত্বকারী বিজ্ঞান।' নীতিশাস্ত্রকে তিনি ম্যাকিয়াভেলীর মত বর্জন করার কথা বলেন নি। কিন্তু রাষ্ট্রনীতির উপর নীতিশাস্ত্রের প্রধান্যকে অস্বীকার করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে 'স্বতন্ত্র' মর্যাদায় সমাসীন করে গিয়েছেন।
- এরিস্টটল রাজনৈতিক বিষয়গুলো অধ্যয়নের যে পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন তা ছিল বিজ্ঞানভিত্তিক। গ্যাটেলের মতে 'এই পদ্ধতির ফলে রাষ্ট্র সম্মন্ধীয় আলোচনা বিজ্ঞানের পর্যায়ভূক্ত হতে পেরেছে। পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বাস্তব গবেষণা এই আরোাহী পদ্ধতির মাধ্যমে রাজনৈতিক বিষয় পঠন ও পাঠনের জন্য এরিস্টটল চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।'
- বাস্তববাদীতা এবং অভিজ্ঞানবাদকে রাজনীতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এরিস্টটল রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে দর্শন ঘেঁষা, অনুমান ও কল্পনা নির্ভরতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে সমাজ বিজ্ঞানের একটি শক্তিশালী শাখায় উন্নীত করেছেন।
- রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অধুনা রাজনীতির একটি বড় সমস্যা। এরিস্টটল স্থিতিশীলতা সম্পর্কে যে তত্ত্ব দিয়েছেন, তা আজও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে চলেছে। রাজনীতি ও অর্থনীতির চিরন্তন সম্পর্কের বিষয়ে তিনিই প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট হলে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়। এ সত্য উপলব্ধি করে এরিস্টটল বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে লাগামহীন অর্থনৈতিক বৈষম্যকে দায়ী করেছেন। শুধু মার্কসীয় দৃষ্টিতে নয়, সমাজবিজ্ঞানের কোন লেখকই তাঁর এ বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন নি। রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার জন্য মধ্যবিত্তের নেতৃত্ত্বের ধারণা এরিস্টটলকে যুগোত্তীর্ন করেছে।

ধনী ও দারিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট হলে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়।

- ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর শাসনের চেয়ে আইনের শাসনই যে উত্তম, এ ধরনের বক্তব্যের জন্য এরিস্টটল রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অমর হয়ে আছেন। কারণ যুগে যুগে প্রমাণিত হয়েছে এবং হচ্ছে যে বিধি সম্মত আইনের প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমেই ব্যক্তির স্বাধীনতা ও মুক্তি

আইন নৈর্ব্যাক্তিক, নিরাশক্ত এবং যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

সুনিশ্চিত হতে পারে। আইন নৈব্যক্তিক, নিরাশক্ত এবং যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এ ধারণার গোড়াপত্তন হয়েছে এরিস্টটলের হাতে।

- সীমিত সরকারের ধারণা এরিস্টটলের সৃষ্টি। আইনের সার্বভৌমত্বের কথা বলে এরিস্টটল নিয়মতান্ত্রিক সরকারের ধারণার সূচনা করেছেন। যার মূল কথা হচ্ছে, সরকার ব্যবস্থা আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সরকারও আইন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে।
- রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপর ভৌগলিক উপাদানের প্রভাবের কথা বলে এরিস্টটল একজন অত্যাধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মত কথা বলে গেছেন। কারণ রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থার সাথে দেশের জলবায়ু, ভৌগলিক ও প্রতিবেশের সম্পর্ক চিরন্তন। আধুনিক ভূ-রাজনীতিতত্ত্ব, ব্যবস্থাতত্ত্ব তাঁর কাছে ঋণী।
- এরিস্টটল তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উৎপত্তির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার ভেতর দিয়ে তিনি এ সংগঠনটির মহৎ উদ্দেশ্যের চিরন্তন বানী উচ্চারণ করে গিয়েছেন। মানুষের সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণ সাধনই হলো রাষ্ট্রের চরম ও পরম লক্ষ্য। একথা কেউই অস্বীকার করতে পারেন নি। রাষ্ট্র ছাড়া কোন ব্যক্তিই সম্পূর্ন হতে পারে না, তাঁর এ বক্তব্যের কোন বিকল্প নাই। এ ভাবে তিনি রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন।

তবে তাঁর অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। যেমন, তার চিন্তার মধ্যে রক্ষণশীল দৃষ্টিভংগির প্রতিফলন, দাস ব্যবস্থাকে সমর্থন, রাষ্ট্রকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে গিয়ে ব্যক্তি ও সমাজকে গুরুত্বহীন করা এ সব সীমাবদ্ধতা আছে। তারপরও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অসামান্য অবদানের জন্য এরিস্টটল হয়তো চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন।

সারকথাঃ

এরিস্টটল রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং স্থায়ী অবদান রেখে গেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বিষয় হিসেবে তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে বিজ্ঞান ভিত্তিক পরীক্ষা নিরীক্ষা, যাচাই, পুনযাচাইয়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির তিনিই অবতারণা করেছিলেন। তিনি ছিলেন আইনের শাসনের প্রবক্তা। এরিস্টটলই নিয়মতান্ত্রিক সরকারের ধারণা র্সবপ্রথম দেন। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রশ্নে তিনি ব্যাপক গবেষণা করে যে ফলাফল রেখে গিয়েছেন তা আজও আমরা ব্যবহার করে থাকি। রাষ্ট্রকে একটি প্রয়োজনীয় মানবীর সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার মূল কৃতিত্ব এরিস্টটলের। এ সব অবদানের জন্য এরিস্টটল অমর হয়ে আছেন এবং থাকবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। এরিস্টটলকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক বলা হয় কারণ তিনি–
(ক) রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বাস্তবসম্মত ব্যাখ্য দিয়েছেন;
(খ) ব্যক্তির শাসনের চাইতে আইনের শাসনকে উত্তম বলেছেন;
(গ) ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নিরূপন করেন নি;
(ঘ) রাষ্ট্রনীতি অধ্যয়নে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অবতারণা করেছিলেন।

২। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য এরিস্টটলের মতে শাসন ক্ষমতা থাকা উচিত
(ক) উচ্চবিত্তদের হাতে;
(খ) নিম্নবিত্তদের হাতে;
(গ) জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের হাতে;
(ঘ) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে।

৩। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাথে নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক এরিস্টটলের মতে কেমন হওয়া উচিত?
(ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে হতে হবে নীতিশাস্ত্রের অধীনস্থ;
(খ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতিশাস্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিবে;
(গ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাকবে;
(ঘ) নীতিশাস্ত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধীনস্থ থাকবে।

সঠিক উত্তরঃ ১। ঘ ২। ঘ ৩। ঘ।

রচনামূলক প্রশ্ন

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১। এরিস্টটলকে কেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলা হয়?
২। কেন এরিস্টটলকে আইনের শাসনের মূল প্রবক্তা বলা হয়?
৩। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এরিস্টটলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান কি?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এরিস্টটলের অবদান মূল্যায়ন করুন।

পাঠ - ৬

এপিকিউরিয়ানবাদ ও ষ্টোয়িক দর্শন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সুখবাদ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবেন;
- ষ্টোয়িক দর্শনের মৌলিক বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

হেলেনীয় যুগে গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাস (৩৪১-২৭০ খ্রীঃ পূ:)-এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে সুখবাদী মতবাদ। এই মতবাদের মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে মানুষের জন্যে সবচেয়ে কল্যাণকর উপাদান হল 'আনন্দ' এবং জীবনের একান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে তা অর্জন করা। এপিকিউরীয়দের ধারণায় সুখ আসতে পারে যাবতীয় ভয়-ভীতি, বিশেষতঃ ঈশ্বর ভীতি, মৃত্যু ভয় ও পরকালের ভীতি ইত্যাদিকে জয় করার মাধ্যমে। তাদের দর্শনের প্রধান লক্ষ্য ছিল মানুষকে জগৎ-জীবন সম্পর্কিত বিষয়াদিতে যাবতীয় ভয়-ভীতির উর্ধ্বে নিয়ে আসা। এপিকিউরীয় দর্শন অতিমাত্রায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী প্রকৃতির। এই দার্শনিক মহলের প্রতিষ্ঠাতা এপিকিউরাস চেয়েছিলেন মানুষের সুখ ও সদ্‌গুণাবলীকে রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে মুক্ত রাখতে। তিনি প্রচার করেন যে, ব্যক্তির কল্যাণ সাধনের জন্য রাষ্ট্রের ধারণা কোন মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে না। এপিকিউরিয়ানবাদের দৃষ্টিতে রাজনীতিতে জ্ঞানী ব্যক্তিদের স্থান নেই; যদি না তারা এ কাজের জন্যে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এ ধরণের জীবন জ্ঞানী ব্যক্তির স্পৃহা ও নীতিনিষ্ঠ অস্তিত্বের সাথে বেমানান এবং বোঝাস্বরূপ। এপিকিউরীয়রা যে-কোন ধরণের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্যের শিক্ষা দেয়, যদি তা সমাজে সুখ ও শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত থাকে। এপিকিউরাসের 'বিজ্ঞ আত্ম-স্বার্থের' ধারণা সাংবিধানিক দক্ষ সরকার পরিচালনায় পরিপুরক। এ চিন্তার অনুসারীদের এটাও শিক্ষা দেয়া হয় যে 'সাংবিধানিক সরকার' এবং 'দক্ষ কর্তৃত্ববাদী' শাসনের মধ্যে পার্থক্য সামান্যই।

এপিকিউরীয় দর্শনের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা। ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মেনে নিয়েই তারা যুক্তি উত্থাপন করতেন যে 'সুখী এবং বিলয়হীন' অতিন্দ্রিয় শক্তি হিসেবে মানুষের কাজকর্মে ঈশ্বরের তেমন কোন আগ্রহ নেই। এভাবে 'মৃত্যু ভয় ও ঈশ্বরের ক্রোধ' থেকে মানুষকে মুক্ত করার প্রয়াস চালায় এপিকিউরীয় দার্শনিকগণ। এপিকিউরাসের মতে, একজন ব্যক্তি তখনই মৃত্যুভয়কে জয় করতে পারে যখন সে আত্মার গঠন সম্পর্কে সঠিক ধারণায় উপনীত হতে সক্ষম। বস্তুবাদী চিন্তাধারার আলোকে তারা দাবি করেন যে, আত্মা হচ্ছে মানুষের সারা দেহে বিস্তৃত সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম অনেকগুলো কোষের সমষ্টি। মৃত্যুর পর দেহের বিনাশ সাধনের সাথে সাথে মানুষের আত্মাও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। দেহের বাইরে যেহেতু আত্মা বিরাজ করতে পারে না; এ জন্যেই মৃত্যুর পর কোন মরণোত্তর জীবনের সম্ভাবনা নেই। তাদের যুক্তিতে, মৃত্যু মানেই পুরোপুরিভাবে বিনাশ হয়ে যাওয়া।

নীতিশাস্ত্রের অন্তর্নিহিত গুণাবলী তথা ন্যায়নীতি, সততা এবং আনন্দ-বেদনার মাঝে ভারসাম্য রক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয় এপিকিউরীয় মতবাদে। এপিকিউরাস মনে করেন আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, পরিমার্জন ও বন্ধনমুক্তি মানুষকে প্রকৃত সুখের স্বাদ এনে দিতে পারে। বস্তুবাদী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ইচ্ছার স্বাধীনতায় আস্থাশীল ছিলেন। এপিকিউরাস শিক্ষা প্রদান করেন - বিশাল মৃত্যু ভীতির হাত থেকে অবমুক্ত হয়ে মানুষ কতটা

স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে সক্ষম। তাঁর মতে, 'মানুষ যা চায় তা হল সুখ এবং যা তারা বর্জন করতে চায় তা হল দুঃখ'। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য 'সুখ' ছাড়া অন্য কিছু নয়। যেহেতু উত্তম কোনকিছুর মাত্রাই হল সুখ, একটি সুখের চাইতে অপর সুখের মাত্রাগত তারতম্য হতে পারে, তা উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট হতে পারে না। এপিকিউরাস আরো দাবি করেন যে, মানুষের সকল উপলব্ধির শুরু এবং শেকড় হল 'উদরের সুখ'; এমনকি প্রজ্ঞা ও সংস্কৃতির সুখও এর সাথে জড়িত। এপিকিউরীয়রা এক্ষেত্রে যা দীক্ষা প্রদান করে তা হল "খাও দাও ফূর্তি কর, কিছুই না বহন কর।"

এপিকিউরীয় দর্শনকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কোন কোন বিশ্লেষক 'লাগামহীন' দর্শন বলে অভিহিত করেন। কেউ কেউ মনে করেন এই দর্শন ছিল অষ্টতায় ভরা। এসব সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও বলা চলে এই দর্শন ছিল ধারাবাহিকতাপূর্ণ। ফলে তাদের সমকালীন ষ্টোয়িক দর্শনের তুলনায় ইতিহাসের চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে আরো একটি জীবন্তড় দর্শন হিসেবে অক্ষুন্ন রয়েছে এপিকিউরীয় চিন্তাধারা। এই দর্শনের অনুসারীদের মাঝে গ্রিক ব্যাকরণবিদ এপোলোডারাস, রোমান কবি হোরাস, রাষ্ট্রনায়ক প্লিনি দ্য ইয়াংগার, কবি লুকরেটাস উল্লেখ্য। এপিকিউরীয় চিন্তাধারা চতুর্থ শতাব্দীতে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী দার্শনিক পিয়ারে গ্যসেন্ডির ছোঁয়ায় পুনর্জীবন ফিরে পায়। অতঃপর ডেভিড হিউম (১৭১১-৭৬) এবং জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২) এপিকিউরীয় মতবাদের উপর ভিত্তি করে রচনা করেন তাঁদের উপযোগবাদী রাষ্ট্র দর্শন। এপিকিউরাসের দর্শনের সাথে পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও তাঁর নিরীশ্বরবাদী চিন্তাধারা যুগ যুগ ধরে বহু মানুষের মাঝে বিদ্যমান। উপরন্তু, এপিকিউরীয় মতবাদ অদ্যাবধি নৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য চিন্তাধারা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে।

ষ্টোয়িক দর্শন

এরিস্টটলীয় চিন্তাধারার পর হেলেনীয় যুগে ষ্টোয়িক দর্শন একটি সাড়া জাগানো মতবাদ হিসেবে বিকশিত হয়। এপিকিউরিয়ানবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী এই মতবাদ এথেন্সের ষ্টোয়া নামক স্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। এই মতবাদের প্রবর্তন সিনিকদের মাধ্যমে হয়ে থাকলেও এর গ্রিক স্থপতি এন্টিসথেনেস ছিলেন সক্রেটিসের শিষ্য। তিন পর্বে বিকশিত হয় এই মতবাদ। প্রথম পর্যায়ে ৩০০-২০০ খ্রিঃ পূঃ। দ্বিতীয় পর্যায় ২০০-৫০ খ্রি. পূ. এবং তৃতীয় পর্যায় রোমান শাসনামল পর্যন্ত বিস্তৃত। প্লেটো অনুসৃত ধারায় ষ্টোয়িক দর্শনের চারটি অন্তর্নিহিত গুণাবলী হলঃ প্রজ্ঞা, সাহস, ন্যায়নীতি ও মিতাচার। এপিকিউরিয়ানবাদের মত ষ্টোয়িক দর্শন ছিল একান্তভাবেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী।

ষ্টোয়িক দর্শনের রয়েছে প্রধান তিনটি ধারা। যথা : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, বিশ্বজনীনতাবাদ ও সামাজিক মতবাদ। এই দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু হল ব্যক্তি, ইচছার দিক থেকে সে স্বায়ত্বশাসিত, সে নিজেই তার আত্মার মনিব এবং ভাগ্যের নিয়ামক। ষ্টোয়িকদের কাছে সদ্‌গুণ আনন্দময় এবং বদ্‌গুণ অনিষ্টকর। সদ্‌গুণ এবং বদ্‌গুণ হল যথাক্রমে ইচ্ছার সঠিক ও ভ্রান্ত- বহিঃপ্রকাশ। ষ্টোয়িকদের মতে ব্যক্তি মানুষের এসব বৈশিষ্ট্য পুরোপুরিভাবে ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ভাবে তারা মতামত জ্ঞাপন করেন যে ব্যক্তির প্রকৃত কল্যাণ তার নিজস্ব ক্ষমতার আওতাধীন। ষ্টোয়িকদের ধারণা একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কেবল তার ইচছার সঠিক দিকটির প্রতিফলন ঘটাবেন।

জীবনের তাৎপর্যকে ষ্টোয়িকরা প্রকৃতিগতভাবে দু'ভাবে উপস্থাপন করেন। প্রথমতঃ ব্যক্তি তার সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী সাধারণ বাসনাগুলো যুক্তিসঙ্গতভাবে পূরণ করতে তৎপর হবে। দ্বিতীয়তঃ একই মানব পরিবারের সদস্য হিসেবে সে অপরাপর সদস্যের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে। ষ্টোয়িকরা আরো মনে করত যে, প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যান্যদের তুলনায় একটি নির্দিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় প্রকৃতি প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী।

একজন ব্যক্তি প্রকৃতিগতভাবে যুক্তির অধীনে কাজ করে এবং যুক্তি হল ব্যক্তির সর্বোৎকৃষ্ট অংশ যার ফলাফল তার মন:পুত না হলেও একে সে সমর্থন করে। একজন যুক্তিশীল মানুষ হিসেবে সে জানে সদ্‌গুণ প্রকৃত অর্থেই ব্যক্তিনিরপেক্ষ এবং তার জীবনে যা কিছু ঘটছে তা প্রকৃতির শাশ্বত বিধান অনুযায়ী ঘটে চলেছে।

মানুষের যুক্তিশীল চিন্তার প্রতি ষ্টোয়িকদের ছিল প্রগাঢ় আস্থা। তারা মনে করত ঈশ্বর যুক্তিশীল এবং মানুষও যুক্তিশীল। মানুষ ঈশ্বরের সন্তান এবং সে হিসেবে প্রতিটি মানুষ একে অপরের ভাই-বোন। যেহেতু মানুষ যুক্তি দ্বারা পরিচালিত, সে হিসেবে তারা সবাই সমান। এ ভাবে ষ্টোয়িকদের ধারণা অনুযায়ী পৃথিবী হল একটি বিশ্ব রাষ্ট্র। এখানে ঈশ্বর ও মনুষ্যকূল সবাই এর নাগরিক এবং এখানে রয়েছে সত্যিকারের যুক্তিশীল সংবিধান, যা মানুষকে কোন্‌ কাজটি করণীয় এবং কোন্‌টি বর্জনীয় তা শিক্ষা দেয়। এখানে সঠিক যুক্তি হল প্রকৃতির আইন, ঈশ্বরের বিধান যার নীতিমালা, শাসক-প্রজা নির্বিশেষে সবার ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য।

ষ্টোয়িকদের মতে, প্রতিটি মানুষের জন্য দু'ধরণের আইন রয়েছে। প্রথমত: তার নগরীর আইন বা রীতি-নীতি; দ্বিতীয়ত: বিশ্ব-নগরের আইন তথা যুক্তির আইন। এ দু'টো আইনের মধ্যে দ্বিতীয়টির বৃহত্তর ক্ষমতা থাকা চাই; এবং এর ভিত্তিতেই রচিত হবে নগরীর শাসনতান্ত্রিক বিধি-বিধান, প্রথা ও রীতি-নীতি। নগরীর রীতি-নীতি বহুবিধ হলেও যুক্তি এক। সেদিক থেকে রীতি-নীতির কাজ হবে যুক্তির উদ্দেশ্যে পরিচালিত হওয়া। এ ভাবে ষ্টোয়িক মতবাদকে দেখা হয় বিশ্ব-বিস্তৃত একটি বিধি ব্যবস্থা হিসেবে যার রয়েছে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা। এ মতবাদ ব্যক্তির সামাজিক স্বাতন্ত্রের গুরুত্বকে পরিহার করে রাষ্ট্রসমূহের মাঝে সমঝোতা বৃদ্ধির প্রয়াস চালায়। এভাবে ষ্টোয়িক দর্শন বিশ্বজনীন মতবাদ থেকে মানবতাবাদে পরিণত হয়। অবশ্য, ষ্টোয়িকরা প্রচলিত দাসপ্রথার বিরোধিতা করে নি। তাদের ধারণা, মানুষের বাইরের পদমর্যাদার চেয়ে তার ভেতরের মানুষটির গুরুত্বই অধিক।

রাষ্ট্রতত্ত্বের ইতিহাসে ষ্টোয়িক দর্শন এক গুরুত্বপুর্ণ স্থান দখল করে আছে। এ মতবাদ প্রাকৃতিক আইনের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে যা পরবর্তীতে রোমান জুরিসপ্রুডেন্সের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। রাষ্ট্রতত্ত্বে খ্রিষ্টিয় মতবাদ, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক চিন্তাধারা বহুলাংশে ষ্টোয়িক দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

সারকথা

এপিকিউরিয়ানবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল ব্যক্তি জীবনের জন্য সর্বময় সুখের অনুসন্ধান। তাদের মতে, যা-কিছুই সুখ বা আনন্দদায়ক তা-ই 'ভালো', আর যা দুঃখ দেয় তা-ই 'মন্দ'। যাবতীয় অকল্যাণ ও ভয়-ভীতির শৃঙ্খল থেকে ব্যক্তিকে অবমুক্ত করে স্বাধীন আনন্দ চর্চাই তাদের লক্ষ্য। তবে এক্ষেত্রে আনন্দ-উপভোগ যাতে লাগামহীন হয়ে না পড়ে সেজন্যে ন্যায়নীতি, সততা ও আনন্দ-বেদনার মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করার পরামর্শ রয়েছে এই মতাদর্শে। ষ্টোয়িক দর্শন অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে মানুষের সমতার বাণীকে প্রতিষ্ঠা করে গেছে। 'বিশ্ব নাগরিকত্বের' ধারণা ষ্টোয়িকদের সৃষ্টি। মানুষের মাঝে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধন এবং বিশ্ব সরকারের ধারণা প্রচার ষ্টোয়িক দর্শনের মৌলিক অবদান। মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি গুরত্বারোপের মাধ্যমে এই মতবাদ রাষ্ট্রতত্ত্বের ইতিহাসে আজো সমুজ্জ্বল হয়ে আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। এপিকিউরিয়ানবাদ কোন্ ধরণের মতবাদপুষ্ট?
(ক) এপিকিউরিয়ানবাদ গণতন্ত্রের সমর্থক;
(খ) এটি স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকে সমর্থন করে;
(গ) এটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে উৎসাহিত করে;
(ঘ) এটি নৈরাজ্যবাদী ভাবধারাকে সমর্থন যোগায়।

২। স্টোয়িক দর্শন অনুযায়ী ব্যক্তি কিসের প্রভাবে কাজ করে?
(ক) ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আইনের প্রভাবে কাজ করে থাকে;
(খ) পুলিশী নির্যাতন ও হয়রানির ভয়ে কর্মতৎপর হয়;
(গ) প্রকৃতিগতভাবে যুক্তির অধীনে কাজ করে থাকে;
(ঘ) রুটি-রোজির প্রয়োজনে কাজ করে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

এপিকিউরিয়ানবাদে মানুষের জীবনের একান্তড় উদ্দেশ্য কি?
স্টোয়িক দর্শন কোথায় কখন বিকশিত হয়?
এপিকিউরিয়ানবাদের সাথে স্টোয়িক দর্শনের মৌলিক পার্থক্য কি?
'দুষ্টের দমন শিষ্টের লালন' প্রবাদটি স্টোয়িক দর্শনের সাথে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। এপিকিউরিয়ানবাদের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
২। স্টোয়িক দর্শনের প্রধান ধারাসমূহ বর্ণনা করুন।

ঠিক উত্তর : ১। গ, ২। ঘ

পাঠ - ৭

রোমান রাষ্ট্রচিন্তা : পলিবিয়াস ও সিসেরো

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পলিবিয়াসের রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- সিসেরোর রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

ঐতিহাসিক পলিবিয়াস (২০০-১২০ খ্রী: পূ:) তাঁর লেখা গ্রন্থ 'হিস্ট্রি অব রোম' রচনার মাধ্যমে বিশ্বে খ্যাতিমান হয়ে আছেন। বিখ্যাত গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস এবং থুসিডাইডস্ এর পরই তাঁর অবদান স্বীকৃত। তিনি আর্কেডিয়া নগর রাষ্ট্রের অন্তর্গত মেগালোপলিস নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তিনি একজন প্রতিশ্রুতিশীল প্রশাসক হিসেবে নগর রাষ্ট্রসমূহের কনফেডারেশন আচেনাস-এর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত হন।

মেসিডোনিয়ায় রোমান আক্রমণ ও বিজয়ের পর একজন সম্ভ্রান্ত আচেয়ান হিসেবে অপরাপর হাজারো বন্দীদের সাথে পলিবিয়াস খ্রি. পূ. ১৬৮ সালে যুদ্ধবন্দী হন। আচেয়ান লীগের নেতা হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত মিথ্যা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে বন্দী অবস্থায় রোমে স্থানান্তর করা হয়। রোমে অবশ্য পলিবিয়াসের আশ্রয় মিলে জেনারেল আমেলাস পাওলাসের গৃহে তাঁরই দুই পুত্র সন্তানের গৃহ শিক্ষক হিসেবে। তন্মধ্যে অনুজ ছাত্র স্কিপিও শীঘ্রই ইটালীর গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োগ লাভ করলে পলিবিয়াসের ভাগ্য কিছুটা সুপ্রসন্ন। ষোল বছর নির্বাসিত জীবন যাপনের পর রোমান সিনেট (১৫১ খ্রিঃ পূঃ) জীবিত আচিয়ানদের গ্রীসে ফিরে যাবার অনুমতি প্রদান করলে পলিবিয়াস তাঁর বন্ধুপ্রতিম ছাত্র স্কিপিও-র সান্নিধ্যে রয়ে যান। স্কিপিও পরিচালিত আফ্রিকা অভিযানে পলিবিয়াস তাঁর সঙ্গী হন এবং খ্রিঃ পূঃ ১৪৬ সালে কার্থেজের পতন ও পোনিক যুদ্ধের সমাপ্তি প্রত্যক্ষ করেন।

রোমান রাষ্ট্রনায়কদের সাহচর্য ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্তি এবং পলিবিয়াসের নিজস্ব প্রশাসনিক দক্ষতা ও যোগ্যতা তাঁদের কাছে স্বীকৃত ও সমাদৃত হবার ফলে পলিবিয়াস রোম ও আচেনাসের মধ্যেকার সমঝোতা স্থাপন মিশনের দায়িত্ব নিয়ে গ্রীসে গমনের সুযোগলাভ করেন। যদিও এই মিশনটি সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয়, তথাপি তিনি গ্রীসের পুনর্গঠনে রোমান সরকারের প্রতিনিধিত্বের সুযোগপ্রাপ্ত হন। এ ছাড়াও তিনি 'রোমানদের' পক্ষে ইউরোপ ও এশিয়ায় বিভিন্ন সামরিক ও কূটনৈতিক মিশনে অংশগ্রহণ করেন।

পলিবিয়াসের পান্ডিত্যপূর্ণ বাস্তব জ্ঞানের প্রতিফলন পাওয়া যায় চল্লিশ খন্ডে সমাপ্ত তাঁর লেখা 'হিস্ট্রি অব রোম' গ্রন্থে। গ্রিক বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার পটভূমি এবং রোমান রাজনীতি ও প্রশাসনের সাথে তাঁর দীর্ঘকালীন সংশ্রব উভয়ের সমন্বয়ে প্রথমবারের মত তাঁকে রোমান সাম্রাজ্যের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। একটি ছোট্ট নগর রাষ্ট্র থেকে বিশাল রোমান সাম্রাজ্যে পরিণত হওয়ার যুগ সন্ধিক্ষণে (২৬৪-১৪৬ খ্রিঃ পূঃ) যেসব রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ সংঘটিত হয় সবকিছুই উঠে আসে তাঁর ইতিহাস রচনায়। বিশেষতঃ পোনিক যুদ্ধের সময় থেকে মেডিসন বিজয় পর্যন্ত তেপ্পান্ন বছরের যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস আপন অভিজ্ঞতায় ব্যাখ্যা করেন তিনি। কেন এবং কিভাবে পৃথিবীর সভ্যজাতিসমূহ একের পর এক রোমান শাসনের পতাকাতলে বিলীন হয়ে যায় সেই শৌর্য-বীর্যের কাহিনী স্থান পায় এই গ্রন্থে।

'হিষ্ট্রি অব রোম' গ্রন্থে পলিবিয়াস সরকারের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এদের প্রকৃতিগত রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধারাকে ব্যাখ্যা করেন। প্লেটো এবং এরিস্টটলের অনুসরণে পলিবিয়াস সরকারের ত্রি-মাত্রিক শ্রেণীবিভাগ তুলে ধরেন। যেমনঃ স্বাভাবিক অবস্থায় রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র এবং এদের অধঃপতিত অবস্থায় যথাক্রমে স্বেচ্ছাতন্ত্র, কতিপয়ন্ত্র এবং হুজুগতন্ত্রে পরিণত হয়। তবে এরিষ্টটলের চাইতেও তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন যে এ সব সরকার ব্যবস্থায় ক্ষমতার ভারসাম্য ও নিয়ন্ত্রণের অভাবে এর অধঃপতনের বীজ রোপিত হয় সেই সরকার ব্যবস্থার অভ্যন্তরেই। পলিবিয়াস এটাও বিশ্বাস করতেন যে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের ভাল উপাদানগুলো যদি একত্র কোন সরকার ব্যবস্থায় প্রয়োগ করা যায় তা'হলে সেটি সরকারের অস্থিতিশীলতা কাটিয়ে স্থিতিশীলতা আনয়নে সহায়ক হবে। স্পার্টা এবং রোমের উদাহরণ টেনে পলিবিয়াস তার যুক্তির যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টা করেন।

রোমের সাংবিধানিক নীতিমালার উল্লেখ করে পলিবিয়াস উল্লেখ করেন যে, এখানে কনসালদের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের নীতিমালা, সিনেটের মাধ্যমে অভিজাতদের প্রতিনিধিত্ব এবং জনপ্রতিনিধি পরিষদের মাধ্যমে গণতন্ত্রের সংমিশ্রণ ঘটানো হয় এবং সরকারের প্রতিটি কাঠামো একে অপরের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারের অভ্যন্তরে একপ্রকার ভারসাম্য রক্ষা করে। এ ভাবে পলিবিয়াসই হলেন প্রথম লেখক যিনি মিশ্র সরকার ব্যবস্থার পক্ষে জোরালো মতামত জ্ঞাপন করেন।

একজন ইতিহাসবেত্তা হিসেবে কেবলমাত্র ইতিহাসের ঘটনা ও দিন-তারিখ লিখেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, বরং সেগুলোর রাজনৈতিক পটভূমির অনুসন্ধান ও বিচার-বিশ্লেষণের কাজে আত্মনিয়োগ ও সেসবের ভবিষ্যত দিক নির্দেশনা প্রদান করেন তিনি। তাঁর লেখার পদ্ধতি সাধারণ অথচ উপস্থাপনা সাবলীল এবং পরিচ্ছন্ন। এটিক ভাষায় লেখা গ্রীক রাজনৈতিক সাহিত্যে অত্যন্ত মূল্যবান দলিল এটি। পলিবিয়াস হলেন প্রথম ঐতিহাসিক যিনি রাজনীতি পাঠে 'প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি' ব্যবহার করেন এবং পরীক্ষা করে দেখান যে একটি রাষ্ট্রের সাবলীল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো জাতীয় শক্তি সঞ্চয়ে কতটা ইতিবাচক ভূমিকা পালনে সক্ষম। রোমের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তার অমিত ঐশ্বর্য বয়ে আনার পেছনে কতটা অবদান রেখেছে সেটিও তিনি পরীক্ষা করে দেখান। তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যবেক্ষণ, রোমান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদির পরীক্ষা-নিরীক্ষা সবকিছু মিলিয়ে তাঁর ইতিহাস রচনাকে কেবলমাত্র ইতিহাসের ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বর্ণনায় সীমাবদ্ধ রাখে নি।

সিসেরো

প্রাচীন রোমান যুগের প্রধান রাজনৈতিক দার্শনিক, রাষ্ট্রনায়ক ও সুবক্তা মার্কাস টালিয়াস সিসেরো (১০৬-৪৩ খ্রীঃ পূঃ) বর্তমান ইটালীর আর্পিনো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কিশোর বয়সে তিনি টালি নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। যৌবনে তিনি আইন , বাগ্মিতা, দর্শন ইত্যাদি বিষয়াদি অধ্যায়ন করেন। সংক্ষিপ্ত সময় সামরিক বিভাগের চাকুরী এবং তিন বছরের আইন পেশায় অভিজ্ঞতা ছাড়া গ্রীস ও এশিয়া ভ্রমণকালে তিনি পাঠাভ্যাস অব্যাহত রাখেন। তিনি ৭৭খ্রিঃ পূঃ রোমে প্রত্যাবর্তন করে রাজনৈতিক পেশা শুরু করেন। এবং ৭৪ খ্রিঃ পূর্বাব্দে সিনেট সদস্য নির্বাচিত হন।

সিসেরো নিজে অভিজাত পরিবারভুক্ত না হয়েও তাঁর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তির কারণে ৬৪ খ্রীঃ পূর্বাব্দে কনসালশিপ নির্বাচনে অধিকাংশ বিত্তবান ও ক্ষমতাশালী রোমনদের সমর্থনে বিজয়ী হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেটলিন তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলে সিসেরো প্রতিদ্বন্দ্বী দলের কিছু সদস্যকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করেন। আসামীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে দ্রুত বিচারকার্য সম্পন্ন করার অভিযোগে সিসেরোকে মিসেডোনিয়ায় নির্বাসনে যেতে হয়। তাঁর নির্বাসনের এক বছরের মাথায় রোমান নরপতি জেনারেল পম্পেই'র সরকারে যোগদান করেন। পম্পেই'র সাথে তখন জুলিয়াস সিজারের

চলছিল ঘোর শত্রুতা। ৪৮ খ্রী: পূর্বাব্দে সিজারের কাছে পম্পেইর পরাজয়ের পর সিসেরো একজন সাধারণ নাগরিকের জীবনযাপন শুরু করেন এবং প্রচুর লেখালেখির কাজে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। ৪৪ খ্রী: পূর্বাব্দে জুলিয়াস সিজারের পালক পুত্র সম্রাট অগাস্টাসকে মার্ক এন্টানির সাথে ক্ষমতার লড়াই-এ সমর্থন করেন। পরবর্তীতে অগাস্টাস ও এন্টোনিওর মাঝে সমঝোতা স্থাপিত হলে ৪৩ খ্রী: পূর্বাব্দে সিসোরোকে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে আত্মাহুতি দিতে হয়।

রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তার কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও সিসেরো ছিলেন একজন চমকপ্রদ লেখক ও দার্শনিক। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন : কবিতা, বাগ্মিতা, বাগাড়ম্বরতা, নীতিশাস্ত্র, রাজনৈতিক দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে তার ছিল অবাধ বিচরণ। তাঁর লেখার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল স্বদেশের মানুষকে গ্রীসের প্রথিতযশা কবি, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের ধ্যান ধারণার সাথে পরিচয় ঘটানো এবং সেগুলো কিভাবে রোমানদের জীবন যাত্রায় প্রযোজ্য হতে পারে তা তুলে ধরা। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ষ্টোয়িকদের দ্বারা এতোই প্রভাবিত হয়েছিল যে তিনি পুরোপুরিভাবে ষ্টোয়িক দার্শনিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

সিসেরোর রাজনৈতিক লেখাগুলো প্লেটো এবং এরিস্টটলের চিন্তাধারার কাছাকাছি হলেও তাঁর লেখায় রয়েছে লক্ষ্যণীয়ভাবে 'অধিকতর ব্যতিক্রম ও সজীবতা'। প্লেটো এবং এরিস্টটল যেখানে নগর রাষ্ট্রের চৌহদ্দির বাইরে তাঁদের চিন্তাকে সম্প্রসারিত করতে পারেন নি সিসেরো সেখানে রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে রাষ্ট্রের আলোচনাকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যান। প্লেটো এবং এরিস্টটলের লেখায় গ্রীকদের জাতিগত উৎকর্ষতা প্রতিষ্ঠা এবং অগ্রীকদের 'বর্বর' হিসেবে দেখার অবকাশ থাকলেও সিসেরো রোমের রাজনৈতিকও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী ফুটিয়ে তোলেন। সিসেরো তার 'ডি রিপাবলিকা' গ্রন্থের মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্ভব, সরকারের শ্রেণীবিভাগ এবং এর শাখাসমূহ দ্বারা কিভাবে, ন্যায়বিচার পরিচালনা করা যায় ইত্যাদি বিষয়াদি আলোচনা করেন। প্লেটোর ল'জ গন্থের সাথে সাজুজ্যপূর্ণ 'ডি লেগিবাস' গ্রন্থের মাধ্যমে সিসেরো রোমান আইন সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সিসেরো বলেন, রাষ্ট্র কেবলমাত্র জনগণের সংঘবদ্ধ প্রয়াস নয় বরং এটি সর্বসাধারণের কল্যাণের উদ্দেশ্য আইনের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপনের এক সমবেত প্রচেষ্টা। রাষ্ট্র টিকে থাকে সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে আইন প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। সিসেরোর মতে, আইনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা রাষ্ট্রকে একটি নৈতিক সম্প্রদায় হিসবে চিহ্নিত করা কর্তব্য। রাষ্ট্র যদি নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে একটি নৈতিক সমষ্টি হিসেবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় এবং এটি যদি নৈতিক ও আদর্শগত বন্ধন দ্বারা যুক্ত না থাকে তা হলে তা রাষ্ট্র না বরং রাজপথে মারাত্মক ডাকাতির' মত ঘটনায় পরিণত হয়। তিনি মনে করেন রাষ্ট্র যদি একনায়ক কর্তৃক কঠোর আইন দ্বারাও শাসিত হয় রাষ্ট্রের টিকে থাকার প্রয়োজনে নৈতিক আইনকে অব্যাহত রাখতে হবে। সিসেরোর মতে মানুষ রাষ্ট্র গড়ার পেছনে একতাবদ্ধ হয় তাদের প্রকৃতির দূর্বলতার জন্যে নয় বরং প্রকৃতিগত সান্নিধ্যের কারণে।

সিসেরোর মতে, রাষ্ট্রকে দীর্ঘদিন টিকে থাকতে হলে তার জন্য প্রয়োজন সরকারী ক্ষমতার-বন্টনের পরিকল্পনা। সরকার নির্দেশনা দায়িত্ব একজনের হাতে থাকতে পারে এবং সে সুবাধে এটি স্বাভাবিক অবস্থায় রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্রর বা গণতন্ত্র হতে পারে। এরিস্টটলের মতোই সিসেরো মনে করতেন শাসকরা আত্নস্বার্থে অথবা জনগণের সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকার পরিচালনা করবে। এই নীতিমালার ভিত্তিতে তিনি ন্যায়নীতির মাপকাঠি নির্ধারণ করেন। সিসেরো সরকারের ত্রিমাত্রিক শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে রাজতন্ত্রকে

উত্তম বলে মনে করেন। তবে তিনি এটাও মনে করেন যে, রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত ভারসাম্যপূর্ণ চতুর্থ ধাঁচের রিপাবলিক সরকার হবে সর্বোত্তম।

সিসোরো রচিত 'ডি রিপাবলিকা' গ্রন্থটি ছিল ন্যায়নীতির পক্ষে একটি বলিষ্ঠ দলিল। এ গ্রন্থের বেশিরভাগ স্থান জুড়েই বিস্তৃত রয়েছে ন্যায়নীতির আলোচনা। তাঁর মতে সত্যিকারের আইন হল প্রাকৃতিক আইন যা যুক্তিশীল চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হয়। এ ধরনের আইন সব যুগের সকল মানুষকে আকৃষ্ট করে। আইন সর্বত্রই এক প্রকার, অপরিবর্তনশীল এবং সব জাতির সকল মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক। প্রকৃতির আইন তথা পরমার্থিক আইনের ধারণাকে বিকশিত করার মাধ্যমে সিসেরো প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানাদিতে বিশুদ্ধ যুক্তিশীলতার উপাদান সন্ধান করেন। এ ধরনের আইনকে সিসেরো সভ্য জীবনের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেন। প্রাকৃতিক আইনকে দেশের জন্য ইতিবাচক বলে চিহ্নিত করে তিনি বলেন এগুলোর আইন যেহেতু উচ্চমার্গীয় যুক্তির মাধ্যমে প্রয়োগযোগ্য এর বাস্তবায়নের জন্য কোন আনুষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষের বাধ্যবাধকতার প্রয়োজন নেই। সিসেরোর এই দর্শন প্রাথমিক যুগের গীর্জা ও মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টিয় ভাবধারার উপর ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে।

প্লেটো এবং এরিষ্টটলের অসমতার ধারাকে খন্ডন করে সিসেরো মানুষের সমতার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। মানুষের সমতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সিসেরো জানান মানুষ শিক্ষা দীক্ষা অথবা সম্পদের দিক থেকে অসমান হলেও মনস্তাত্বিক দিক থেকে তথা যুক্তিশীল চিন্তার অধিকারী হিসেবে প্রত্যেকেই সমান। তার মতে, ভ্রান্ত পদক্ষেপ, বদ গুণাবলী, মিথ্যাচার মানুষের মধ্যে অসমতা তৈরি করে। সিসেরো এরিষ্টটলের মত বর্ণগত বৈষম্যে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মতে সব মানুষ টিকে থাকার জন্য সমান সামর্থ্য ধারন করে এবং সব ধরনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেই তাঁরা ভাল মন্দের প্রকারভেদ নির্ণয় করতে সক্ষম। সিসেরোর রাজনৈতিক চিন্তাধারার অপর উল্লেখ্যযোগ্য দিকটি হল উত্তম সরকারের ভিত্তি হিসেবে জনগণের সম্মতির প্রতি গুরুত্বারোপ করা। সিসেরোর মতে জনগণের এই ক্ষমতার স্বীকৃতি ছাড়া স্বাধীনতার কোন অর্থ হতে পারে না। তাঁর মতে, স্বাধীনতার চাইতে সুন্দর আর কিছু নেই; এর মাত্রা সবার জন্য এক ও অভিন্ন। মোটকথা, সিসেরোর স্বাধীনতা বিষয়টিতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রথমত: স্বাধীনতা সকল নাগরিককে তাদের শ্রেণী-বর্ণ নির্বিশেষে দেয়া প্রয়োজন এবং দ্বিতীয়ত: জনগণের সম্মতিকে বৈধ সরকারের একমাত্র ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। এ ভাবে সম্মতির প্রতি গুরুত্বারোপের বিষয়টি যা কিনা আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদ জন লকের চিন্তাধারায় গুরুত্বের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে রাষ্ট্রতত্ত্বের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

সারকথা

ঐতিহাসিক পলিবিয়াস রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান বিষয়ক রাজনৈতিক গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে খ্যাতির শীর্ষে আরোহন করেন। তাঁর বস্তুনিষ্ঠ লেখনীতে মাত্র অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে একটি ছোট্ট নগর রাষ্ট্র থেকে রোম কিভাবে একটি বিশ্ব সাম্রাজ্যে পরিণত হয় তা বিধৃত হয়েছে। রোমের এই অসামান্য সাফল্যের পেছনে এর মিশ্র সরকার ব্যবস্থা, ক্ষমতার ভারসাম্য, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও নিয়ন্ত্রণ নীতি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদির অবদানকে তিনি অত্যন্ত তাৎপর্যের সাথে ব্যাখ্যা করেন।

সিসেরো প্রাচীন গ্রীক চিন্তাধারার ভিতকে খন্ডনের মাধ্যমে মানুষের সমতা ও স্বাধীনতার ধারণাকে সম্প্রসারিত করে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাপ্ত সম্মানের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। মানুষের যুক্তিশীল চিন্তানির্ভর ন্যায়বিচার ধারণা তাঁরই উদ্ভাবিত। তিনি নৈতিককতা ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রবক্তা হিসেবে কাজ করেন। মানবতাবাদী রাষ্ট্রচিন্তার ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম চিন্তাবিদ। তাঁর দর্শন নীতিশাস্ত্র, সাহিত্য, আইনশাস্ত্র ও রাজনীতির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এবং এখানেই তাঁর চিন্তার বিশেষত্ব।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। পলিবিয়াস কোথাকার নাগরিক ছিলেন?
(ক) স্পার্টা;
(খ) আর্কেডিয়া;
(গ) রোম;
(ঘ) এথেন্স।

২। সিসোরো কোন দেশের মানুষ ছিলেন।
(ক) ভারতবর্ষের;
(খ) চীন দেশের;
(গ) রোম দেশের;
(ঘ) ইতালীর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। পলিবিয়াস প্রণীত সরকারের শ্রেণীবিভাগ কি?
২। ক্ষমতার ভারসাম্য ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পলিবিয়াসের মতামত কি ছিল?
৩। সিসোরো কি জন্য বিখ্যাত ?
৪। ন্যায়বিচার অর্থে সিসেরো কি বুঝাতে চেষ্টা করেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। রাষ্ট্রতত্ত্বের ইতিহাসে পলিবিয়াসের খ্যাতির কারণসমূহ আলোচনা করুন।
২। সিসোরোর রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রধান দিকগুলো আলোচনা করুন।

সঠিক উত্তর : ১। খ, ২। গ